শ্রীশ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চৈতন্যর শ্রী ফেরানো

শ্রীযুক্ত সুমন্ত ঠাকুর (গোস্বামী)

BANGLADARSHAN.COM

নিয়ম সেবা

"নিয়ম সেবা" এই নামটির সঙ্গে যারা বৈষ্ণবীয় শাস্ত্র বা সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করে, তারা সবাই অল্প বিস্তর পরিচিত। নিয়ম পালন করে নিষ্ঠা সহকারে গোবিন্দের সেবা করাই হল 'নিয়ম সেবা।' কলিযুগ পাবনাবতার শ্রী শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বারংবার "নিষ্ঠা" এই শব্দের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি নবধাভক্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন–

"কেহ সাধে এক, কেহ সাধে, বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা করি সাধিলে, জাগে প্রেমেরও তরঙ্গ।"

(চৈতন্য চরিতামৃত)

এখন অনেকেই বৈষ্ণব ধর্মকে, শাস্ত্রকে নিজের মতো বিশ্লেষণ করে কলুষিত করছেন। তাদের মতে কোনো ব্যক্তির ভগবত প্রাপ্তি করিতে গেলে, 'নিষ্ঠার' প্রয়োজন নেই। এই বিষয়ে একটি উদাহরণের সাহায্যে শ্রোতাদের কাছে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সোনা চিনতে হলে যেমন কষ্টিপাথরে সোনাকে যাচাই করে নেওয়া হয় তেমনই ভক্তে বা সাধকের ভক্তিটি বিশুদ্ধ না ভেজাল তা যাচাই করার কষ্টিপাথরই হল 'নিষ্ঠা', এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন –

BANGLADARSHAN.COM

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনাঃ মম॥ (১১।১৯।২০)

অর্থাৎ, হে উদ্ধব যে জন আমার ভক্তি প্রাপ্ত করতে অভিলাষী সেইজন শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার কথা শুনবে, নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমার গুনকীর্তন করবে, অতি নিষ্ঠাযুক্ত হয়ে আমার পূজা করবে এবং স্ত্রোত্র সহযোগে স্তুতি করবে।

এই 'নিয়ম সেবা' কার্ত্তিক মাসের পালনীয় ব্রত। কিন্তু এই ব্রতেরও পূর্বে আষাঢ় মাসের 'শয়ন একাদশী' থেকে কার্ত্তিক মাসের 'উত্থান একাদশী' অথবা আষাঢ় পূর্ণিমা থেকে 'রাস পূর্ণিমা' অথবা 'আষাঢ় সংক্রান্তি (বাংলা মাসের শেষ তারিখেই সংক্রান্তি বলে) থেকে কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত চারমাস যাবত চাতুরর্মাস্য ব্রত শুরু হয়। আর চাতুঃমার্স্য ব্রতের সমাপণ ঘটে কার্ত্তিক মাসে নিয়ম সেবার মাধ্যমে। এই প্রবন্ধে আগে 'চাতুঃমার্স্য ব্রত' নিয়ে আলোচনা করব। তারপর 'নিয়ম সেবা' নিয়ে আলোচনা করব। শ্রীমদ্ভগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে, দেবর্ষি

নারদ নিজের পূর্বজন্মের কথা মহর্ষি বেদব্যাসকে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, "তিনি পূর্বজন্মে এক দাসীপুত্র ছিলেন। যে দাসী এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের দাসী ছিল। সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের গৃহে চাতুঃর্ম্মাস্য ব্রত করার জন্য সদজন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধুদের আগমন হলে দাসী এবং দাসীপুত্র রূপে তিনি নিযুক্ত থাকতেন। এই চারমাস (শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এবং কার্ত্তিক) তিনি সেই মহৎজনদের কাছে হরিগুণ কীর্তন শ্রবণ করতেন এবং তাদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করতেন। এইভাবে তাঁর হৃদয় থেকে সম্পূর্ণ মায়ার নাশ হল। ভগবানের ইচ্ছাতে সংসার বন্ধন স্বরূপ তাঁর মায়ের মৃত্যু হলে তিনি সংসার পরিত্যাগ করে বনে গিয়ে শ্রীগোবিন্দের ধ্যানে মগ্ন হলেন। কালান্তরে শ্রীহরি তার হৃদয়ে ক্ষণ মুহূর্ত দর্শন দিয়ে অদৃশ্য হলেন। শূন্যে বাণী দ্বারা তাকে বললেন, এই দেহে তিনি আর ভগবানের দর্শন পাবেন না। তবে দেহত্যাক্ত হলে পরবর্তী দেহে তিনি তাঁর সহচর্য্য দান করবে। কালান্তরে তিনি দেহত্যাগ করলেন এবং ব্রহ্মার দ্বারা দেবর্ষি নারদ রূপে প্রকট হলেন। এইরূপে আমরা শ্রীমদ্ভগবতের প্রথম স্কন্ধেই চাতুঃর্ম্মাস্য ব্রতের উল্লেখ পাই। এছাড়া শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে থাকাকালীন চাতুঃর্ম্মাস্য ব্রত করছিলেন, তার বর্ণনা "রামচরিত মানসে" এবং বাল্মিকী 'রামায়ণে' আছে। চৈতন্য চরিতামৃত দক্ষিণ ভারতের বেঙ্কট ভট্টের গৃহে শ্রীমন্ মহাপ্রভু চাতুঃর্ম্মাস্য ব্রত করেছিলেন তার উল্লেখ আছে।

BANGLADARSHAN.COM

এই চাতুঃর্ম্মাস্য শব্দের অর্থ চারমাস। এই চাতুঃর্ম্মাস্য ব্রত প্রত্যেক বর্ণের, প্রত্যেক আশ্রমের, প্রত্যেক বয়সের ব্যক্তিগণই করতে পারে। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত হয়েছে –নিয়ম বা ব্রত অথবা জপ ছাড়া চাতুঃর্ম্মাস্য যাপন করলে সেই মূর্খ ব্যক্তিকে জীবিতাবস্থাতেও মৃত তুল্য জানিবে। অর্থাৎ, যারা এই চারমাসে যথা –শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এবং কার্ত্তিক কোনো ব্রত কোন নিয়ম, কোনো জপ না করে তারা জীবিত হলেও শাস্ত্রের কাছে এবং শাস্ত্র প্রণেতা ঋষিগণের হৃদয়ে বিরাজকারী শ্রীভগবান গোবিন্দের কাছে সেই মূর্খ ব্যক্তিরা মৃত তুল্য। আষাঢ় মাসের শয়ন একাদশী অথবা কর্কট সংক্রান্তি বা আষাঢ় সংক্রান্তি অথবা আষাঢ় পূর্ণিমাতে এই চাতুঃর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণ করতে হয়। এইরূপ তিনটি তিথি বিধান নিরুপণ শাস্ত্রে করা হয়েছে। কারণ যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে কোনো বছর প্রথম তিথিতে ব্রত ধারণ করতে না পারে, তাহলে দ্বিতীয় তিথিতে ব্রত ধারণ করবে। যদি দ্বিতীয় তিথিতে ব্রত ধারণ করতে না পারে তাহলে তৃতীয় তিথিতে ব্রত ধারণ করবে। যেইজন শায়ন একাদশীতে ধারণ করবেন, তিনি উত্থান একাদশীতে বা কার্ত্তিক শুক্লা একাদশীতে, যিনি আষাঢ় সংক্রান্তিতে ব্রত ধারণ করবেন তিনি কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে, যিনি আষাঢ় পূর্ণিমাতে ব্রত ধারণ করবেন তিনি কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে বা রাস পূর্ণিমাতে ব্রত সমাপন করবেন।

এইবার চাতুঃর্ম্মাস্য ব্রতের নিয়মগুলি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। স্কন্ধ পুরাণে নাগরখণ্ডে বলা হয়েছে –শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে আমিষ বর্জন করতে হয়। এই পুরাণেই ব্রহ্মা নারদ সংবাদে ব্রহ্মা বলেছেন, "হে দ্বিজত্তম! শ্রীহরি শয়ন করলে যে ব্যক্তি নিস্পাব (শিম) ও রাজমাষ (বরবটী) ভক্ষণ করে, চণ্ডাল থেকেও সেই

ব্যক্তি অধিক নিকৃষ্ট। জনার্দ্দন শয়ন করলে কলমি শাক, পটল, বার্ত্তাকু (লাউ) এবং সন্ধিত (এক প্রকারের বৃক্ষ) ভক্ষণ করলে সাত জন্মের পূর্ণক্ষয় হয়ে যায়।" এই ব্রত অর্থাৎ চাতুঃর্ম্মাস্য ব্রতে একবার ভক্ষণ বা হবিষান্ন গ্রহণ করতে হয়। নিত্যস্নান করতে হয়। ভূমিতে শয়ন করতে হয়। এই চারমাস লবণ, তৈল্য, মধু, তাম্বুল ত্যাগ করতে হয়। এই চারমাসে সুরা বা মদ্য ত্যাগ করলে ব্যক্তি ব্যাধিহীন, রোগহীন ও মহতেজা হয়। একদিন অন্তর আহার করলে ব্রহ্মধামে সম্মানের পাত্র হয়। এই চারমাস কোনো ব্যক্তি নখ ও লোম ধারণ করে, তাহলে তিনি প্রতি মুহুর্তে গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত বিধান ভবিষ্য পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। এই বিষয়ে বলা ভারতীয় ঋষিগণের দ্বারা প্রকাশিত শাস্ত্র সবসময় বিজ্ঞান সম্মত। বর্ষার শেষমাস শ্রাবণ, শরৎ এর দুই মাস ভাদ্র এবং আশ্বিন, হেমন্তের প্রথম মাস কার্ত্তিক এই তিনটি ঋতুর মধ্যে চাতুঃর্ম্মাস্য পালিত হয়। এই চারটি মাসে যে যে বস্তু গ্রহণ করলে শরীর সুস্থ এবং মন শান্ত ও নির্মল হয় সেই সেই দ্রব্য গ্রহণ করতে এবং যে যে দ্রব্য ত্যাগ করলে শরীরের মধ্যে থাকা বাত, কফ ও পিত্তের (আয়ুর্বেদানুসারে) বৃদ্ধি না হয় এবং শরীর সুস্থ থাকে সেই সব দ্রব্য ত্যাগের নির্দ্দেশ শাস্ত্রে চাতুঃর্ম্মাসের বিধানে উল্লেখিত হয়েছে।

এই চাতুঃর্ম্মাস্য ব্রতের মধ্যে শ্রাবণ মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আনন্দ সহকারে পবিত্রোরোপণোৎসব এবং পূর্ণিমা তিথিতে ঋষিতর্পন করেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পাট, পদ্ম, কার্পাস, কাশ ও কুশ নির্মিত সূত্রকেই পবিত্র বলা হয়। মহাসংহিতায় বলা হয়েছে যদি কেউ স্বর্ণ দ্বারা পবিত্র তৈরী করতে অক্ষম হন তিনি রৌপ্য দ্বারা, রৌপ্য দ্বারা অক্ষম হলে তাম্র দ্বারা, তাম্র দ্বারা অক্ষম হলে পট্ট দ্বারা পবিত্র তৈরী করবে। ১০৮টি সূত্রে পবিত্র প্রস্তুত করে ১০৮টি গ্রন্থি দিয়ে পবিত্র নির্মাণ করতে হয়। এইরূপ পবিত্রকে বনমালা বলা হয়। এই পবিত্র নির্মাণ করে শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীভগবানকে পবিত্র অর্পণ করতে হয়। পবিত্র নিবেদন মন্ত্র –

"ন মে বিঘ্নো ভবেৎ ত্বত্র কুরু নাথ দয়াংময়ি।
সর্ব্বথা সর্ব্বদা বিষ্ণো মম ত্বং পরমা গতি॥"

দেশকাল অনুসারে একমাস অথবা একপক্ষ অথবা এক দিবারাত্র অথবা ত্রিরাত প্রভুকে পবিত্র ধারণ করাতে হয়। তারপর পবিত্র সরোবর অথবা নদীতে বিসর্জন করতে হয়। বিসর্জনের মন্ত্র –"ওঁ সাম্বৎসারীং শুভাং পূজাং সম্পদ্য বিধিবন্মম। ব্রজেজদানীং পবিত্র ত্বাং বিষ্ণুলোকং বিসর্জ্জিতম্॥" বৃহবৃচপরিশিষ্ট নামক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যিনি পবিত্র আচরণ করেন, তাঁর উপর হরি সন্তুষ্ট হন। শাস্ত্রবিধানানুসারে পবিত্রারোপন না করলে রাক্ষসগণ তার বার্ষিকী সমস্ত পূজার ফল হরণ করেন। শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন শ্রীভগবানের হস্তে ডোর বন্ধন করা হয়। এই ডোরকেই ঋষিত বলা হয়। এই পবিত্রারোপন এবং ঋষিতরোপন বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে বঙ্গে এই দুটি উৎসব করা হয় না। প্রয়োজনও নেই। তবুও শ্রাবণকৃত্য হিসাবে পবিত্রারোপন এবং ঋষিতপর্ণ অর্পণ বলা হয়।

BANGLADARSHAN.COM

এরপর ভাদ্র মাসে জনাষ্টমী নির্ণয় করে জনাষ্টমী ব্রত গ্রহণ করা হয়। এই বিষয়ে বলা হয়েছে, যদি ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি রোহিনী নক্ষত্র যুক্ত হয় তাহলে সেই তিথি জন্মাষ্টমীব্রত পালন করা উচিত। যদি কণামাত্র (ক্ষণমুহূর্ত) রোহিনীর যোগ হলে সেই তিথিকে জয়ন্তী বলা হয়। ঐ তিথিতে জন্মাষ্টমী ব্রত গ্রহণ করা কর্তব্য। সবসময় সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পরিত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ যদি ধরুন সোমবার সূর্যদয়ে সপ্তমী এবং মধ্যাহ্নে অষ্টমী যুক্ত হয়ে মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত অষ্টমী থাকে। এইক্ষেত্রে সোমবার যেহেতু সপ্তমীযুক্ত অষ্টমী, তাই সেইদিন জন্মাষ্টমী না করে পরের দিন জন্মাষ্টমী ব্রত ধারণ করতে হয়। বিদ্ধা বিষয়ে শাস্ত্রে বলা হয়েছে সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট আগে পর্যন্ত যদি সপ্তমী থাকে, তাহলেও তাকে সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী ধরা হবে। এইভাবে ব্রত নির্ণয় করে ব্রতের আগের দিন সংযম করা উচিত। তারপর ব্রতের দিন যদি সম্ভব হয় মধ্যরাত্র পর্যন্ত উপবাস করে শ্রীকৃষ্ণের অভিষ্যেক করা উচিত। অভিষ্যেক সম্ভব না হয় তাহলে শ্রীভগবানের জন্মলীলা স্মরণ করা উচিত। অভিষ্যেক পূর্ণ হলে অল্প প্রসাদ (অন্ন ও শষ্য বর্জিত বা অন্ন ও শষ্য ছাড়া) গ্রহণ করা উচিত। পরের দিন যথা সময়ে ব্রতের পারণ করা উচিত। একইভাবে ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত পালন করতে হয়। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথির সঙ্গে শ্রবণা নক্ষত্র যোগ হয় তাহলে সেই দ্বাদশী মহাদ্বাদশী রূপে পরিগণিত হয়। এই দ্বাদশীকে বিজয়া মহাদ্বাদশী বলে। ঐদিন বামনদেবের অভিষ্যেক করা কর্তব্য। ভাদ্র শুক্লা একাদশীর দিন শ্রীহরি পার্শ্বপরিবর্তন করেন। তাই এই একাদশীকে পার্শ্বএকাদশিও বলা হয়। শ্রীহরি আষাঢ় শুক্লা একাদশী তিথিতে শয়ন করেন। এই কারণে এই তিথিতে শয়ন একাদশী বলা হয়। ঐ দিন থেকে চারমাস শয়ন করেন। ঐ একাদশী (শয়নাকাদশী) থেকেই চাতুঃর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণ করা হয় যা পূর্বে বলা হয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

এরপর আশ্বিন মাস উপস্থিত হলে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে বৈষ্ণবগণ মিলিত হয়ে বিজয়োৎসব করা কর্তব্য। যে কারণে এই দশমী তিথিকে বিজয়া দশমী বলা হয়। যারা সর্বত্র জয় কামনা করেন তারাও বিজয়োৎসব করতে পারেন। শমী নামক তরু মূল আদ্র মাটি যুক্ত উৎপাটন করে বা তুলে গীত বাদ্য সহকারে শ্রীভগবানের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমার সামনে সিংহাসনের উপর স্থাপন করবে। এই আশ্বিন শুক্লাদশমীর দিন শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাপতি রাবণকে বধ করে, অধর্মের লঙ্কাতে ধর্মের জয়ের সূচনা করেছিলেন বলে বিজয়োৎসব করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। তবে স্মরণে চিন্তনে সেইদিন শ্রীরামের লঙ্কা বিজয় চিন্তা করা উচিত।

শ্রাবণ, ভাদ্র এবং আশ্বিন এই তিনমাস গত হলে উপস্থিত হয় কার্ত্তিক মাস বা দামোদর মাস। এই বিষয়ে বলা প্রয়োজন প্রত্যেক বাংলা মাসে শাস্ত্রে বিশেষত বৈষ্ণব শাস্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ নামে খ্যাত। যথা –বৈশাখ-মধুসূদন, জ্যৈষ্ঠ-ত্রিবিক্রম, আষাঢ়-বামন, শ্রাবণ-শ্রীধর, ভাদ্র-হৃষিকেশ, আশ্বিন-পদ্মনাভ, কার্ত্তিক-দামোদর, অগ্রহায়ণ-কেশব, পৌষ-নারায়ণ, মাঘ-মাধব, ফাল্গুন-গোবিন্দ, চৈত্র-বিষ্ণু এবং অধিমাস-পুরুষোত্তম নামে খ্যাত। যে মাসের

ভগবানের নাম উল্লেখ করা হয়, সেই মাসে শ্রীভগবানের সেইরূপেই আরাধনা করা হয়। যেমন কার্ত্তিক মাসের নাম দামোদর অতএব এই মাসে দামোদর এর অর্চ্চনা করা কর্তব্য। এই দামোদর মাসেই চাতুঃর্ম্মাস্য ব্রত সমাপণ এবং "নিয়ম সেবা" পালন করা হয়। কার্ত্তিক মাসের ব্রতের বিষয়ে স্কন্ধ পুরাণে ব্রহ্মা তার পুত্র নারদকে উপদেশ স্বরূপে বলেছেন, "হে ধার্মিক প্রবর ! দুর্ল্লভ মানব জন্ম ধারণ করে যে ব্যক্তি কার্তিকোক্ত ধর্মানুষ্ঠান করেন না, তাকে পিতৃ-মাতৃহত্যাপাতকে লিপ্ত হতে হয়। কোনরূপ নিয়ম পালন না করে কার্ত্তিক মাসে অতিবাহিত করলে সে তির্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তাপস শ্রেষ্ঠ! কার্ত্তিক মাসে ব্রত না করলে, ব্রহ্মহন্তা, গোহন্তা, স্বর্ণস্তেষী ও নিরন্তর মিথ্যাভাষী বলে পরিগণিত হয়।" হে মুনি শ্রেষ্ঠ! বিশেষত বিধবা হইয়া কার্ত্তিক ব্রত না করলে নিঃসন্দেহে সে নরক গমন করে। গৃহী কার্ত্তিক ব্রত না করলে তার যাবৎ সব ক্রিয়া নিস্ফল হয় এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত নরকে অবিহিত করে। বাহ্মণ হয়ে কার্ত্তিক মাসে ব্রত বিমুখ হলে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ তার প্রতি বিমুখ হন। এইগুলি সবই শ্লোকাকারে স্কন্ধ পুরাণে কথিত হয়েছে। প্রবন্ধের কলেবর আরও যাতে বর্ধিত না হয় তাই শ্লোকগুলি লিখলাম না। কার্ত্তিক মাসের ব্রতের মাহাত্ম্য স্বরূপে আমরা যা শুনলাম সবই শাস্ত্র। এই বিষয়ে বলা প্রয়োজন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দর্শনে দুটি প্রমাণকেই মান্যতা দেওয়া হয়। যথা –প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং অনুমান প্রমাণ। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র প্রমাণকেও মান্যতা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় শাস্ত্র প্রমাণকেই সর্বজন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে ভারতীয় দর্শনে। আর বেশি কী বলব, যদি আমরা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি তাহলে তাঁর এবং তাঁর অনন্য প্রিয় ভক্ত এবং প্রজ্ঞাবান বেদ ব্যাসাদি ঋষিদের প্রবর্তিত শাস্ত্রকেউ বিশ্বাস করতে হবেই।

BANGLADARSHAN.COM

এখন কার্ত্তিকের ব্রত বিধি কথিত হচ্ছে। কার্ত্তিক মাসের বিধি বিষয়ে পদ্মপুরাণে বলেছেন –"কার্ত্তিকে ভূমিশায়ী যে ব্রহ্মচারী হবিষ্যভূক, পলাশপত্রং ভূঞ্জনো দামোদরমথার্চ্চয়েৎ, সব সর্ব্বপাতকং হিত্বা বৈকুণ্ঠে হরিসান্নিধৌ মোদতে বিষ্ণুসদৃশো ভজনানন্দ নির্বৃতঃ॥" অর্থাৎ যিনি কার্ত্তিক মাসে ভূমিশয্যাশায়ী, ব্রহ্মচর্যবান, হবিষ্যভোগী হয়ে পলাশপত্রে ভোজন করেন তাঁর সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়ে বৈকুণ্ঠে আনন্দভোগ করেন। এছাড়া কার্ত্তিক মাসে প্রতিদিন ব্রহ্ম মুহূর্তের পূর্বে উঠতে হয় (সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট পূর্বের সময়কে ব্রহ্ম মুহূর্ত বলে)। প্রাতঃ স্নান, তুলসীসেবা, উদযাপন অর্থাৎ নিত্য রাধাদামোদরাষ্টকম্ পাঠ ও অর্চ্চনা, দীপার্পণ এই পাঁচটি (জাগরণ, প্রাতঃস্নান, তুলসীসেবা, উদযাপন ও দীপার্পণ) নিয়ম সেবার অঙ্গ। তাই এই পাঁচটি অঙ্গ পালনের প্রচেষ্টা করতে হয়। নিয়ম সেবাতে মূল 'নিয়ম' অর্থাৎ সংকল্প করে এক মাস যাবত সেই সংকল্প পালন করা বা নিয়ম পালন করে গোবিন্দের স্মরণ মনন করে সেবা করাই "নিয়ম সেবা" নামে কথিত। এই নিয়ম সেবাতে বেশি বেশি করে নামকীর্ত্তন এবং বেশি বেশি হরিকথা শ্রবণ, নিয়ম করে দেবমন্দির দর্শন, তীর্থে গমন, মঙ্গল আরতি দর্শন, উৎসবাদি

পালন প্রভৃতি ভক্তজনেরা করে থাকেন। এই কার্ত্তিক মাসে হবিষ্যন্ন বা একপাকে রন্ধিত অন্ন গ্রহণই সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তিনদিন অথবা একদিন হবিষ্যন্ন গ্রহণ (এটি মহাজনদের মত) করলেও পূর্ণ নিয়মসেবার ফল প্রাপ্ত হয়। এই দামোদর মাসে কলমি শাক, পটল, বেগুন, শিম, বরবটি বর্জন করতে হয়। কংস পাত্র বা কাঁসার পাত্রে ভোজন কার্ত্তিক মাসে নিষিদ্ধ।

কার্ত্তিক মাসে দীপদানের একটি অশেষ মাহাত্ম্য আছে। এই বিষয়ে স্কন্ধ পুরাণে বলা হয়েছে –এই মাসে হরিমন্দিরে দীপদান করলে তাকে আর ধরাধামে ফিরে আসতে হয় না। কার্ত্তিক মাসে হরি সম্মুখে দীপ দান করলে তার সর্ব তীর্থ স্নান ও নিখিল যজ্ঞ করার পুণ্য অর্জিত হয়। কার্ত্তিক মাসে আকাশদীপ দান করলে তিনি ধন-ধন্যবান, সমৃদ্ধশালী, পুত্রবান, সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান হন। তাঁর পিতৃপুরুষগণ উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হন। আকাশদীপ দান মন্ত্র –"দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ। প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোহনন্তায় বেধসে।" স্কন্ধ পুরাণে বলা হয়েছে, যিনি শ্রীহরির মন্দিরে দীপমালা রচনা করেন তিনি দীপালোকিত পথে হরির পরম পদে বৈকুণ্ঠে গমন করে থাকেন। কেউ যদি অন্য ব্যক্তির প্রদত্ত দীপ উর্দ্ধোধিত (শিখাকে বর্ধিত করে) তাহলে সেই ব্যক্তিও মহাযজ্ঞ সাধনের ফল পেয়ে থাকে। কোনো মূষিকা (স্ত্রী ইদুঁর) একাদশী দিনে অন্যদত্ত প্রদীপ উদ্দীপিত করে দিয়েছিল বলে দুস্প্রাপ্য নরজন্ম প্রাপ্ত হয় এবং অন্তিমে পরমা গতি লাভ করেছিল। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিরই কার্ত্তিক মাসে দীপদান করতে হয়ই।

কার্ত্তিক মাসে বা দামোদর মাসে শ্রীদামোদরের প্রীতির জন্যে নিজের সাধ্যানুসারে উৎসব করা উচিত। যদি উৎসব করতে সমর্থ না হয় তাহলে শ্রীভগবানের উৎসবে সম্মিলিত হয়ে উৎসব উদ্যাপন করতে হয়। এই মাসে যে যে উৎসবগুলি হয় তা হল–পাশাঙ্কুশা একাদশী বা আশ্বিন শুক্লা একাদশী পালন, কার্ত্তিক কৃষ্ণাষ্টমীর অর্ধরাত্রে স্নান, কার্ত্তিক কৃষ্ণা একাদশী বা রমা একাদশী পালন, কার্ত্তিক কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে গৃহের বাহিরে যমদীপ দান করা, কার্ত্তিক পূজা চতুদ্দর্শী তিথিতে বা ভূতচতুদ্দর্শী তিথিতে ধর্মরাজ যমরাজের অর্চ্চনা, কার্ত্তিক অমাবস্যাতে লক্ষ্মীর অর্চ্চনা, কার্ত্তিক শুক্লাপ্রতিপদ তিথিতে অন্নকুট এবং গোবর্দ্ধন পূজা, (গোপূজা, বলিদৈত্যের পূজা, কার্ত্তিক শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যমের অর্চ্চনা, যমুনা স্নান সম্ভব না হলে যমুনা স্মরণে সরোবর বা গঙ্গাতে স্নান), যমুনা বা সরোবর বা নদীতে যমুনার উদ্দেশ্যে দীপ দান, কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমী তিথিতে গোষ্টাষ্টমী পালন, কার্ত্তিক শুক্লা একাদশী বা উত্থান একাদশী পালন, কার্ত্তিক শুক্লাপক্ষীর পূর্ণিমা বা রাস পূর্ণিমাতে রাসোৎসব প্রভৃতি উৎসব। এই উৎসব নিয়ে লিখতে গেলে অকারণে প্রবন্ধ আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই এই বিষয়ে আর আলোচনা করলাম না। পরে কোনো স্থানে এই উৎসবগুলি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেলে আলোচনা করব। এমনিতেই এই প্রবন্ধের কলেবর বেশ বড়ো হয়ে গিয়েছে। তবে এই বিষয়ে বলা যে, যারা তথাকথিত শিক্ষিত তাদের হয়তো এই প্রবন্ধ পড়ে মনে হতে পারে এখানে শুধু শাস্ত্রের নিরস কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের জন্য আমি এই প্রবন্ধ রচনা করিনি। যাদের হৃদয়

BANGLADARSHAN.COM

গৌরগোবিন্দের প্রেমরসের এক কণা প্রাপ্ত করে, প্রেমসমুদ্র স্বরূপ গৌরগোবিন্দের চরণপ্রাপ্তির প্রচেষ্টা রত তাদের জন্য চাতুঃর্ম্মাস্য এবং নিয়মসেবার বিধি, মাহাত্ম্য বর্ণনার প্রচেষ্টা করলাম। এখানে যে চাতুঃর্ম্মাস্য ব্রতের বিবরণ করা হল সেই বিষয়ে মহাজনরা বলেন যদি কোনো ব্যক্তি চাতুঃর্ম্মাস্য করতে অক্ষম হয় তা হলে সে যদি নিয়মপূর্বক দামোদর মাসে কার্ত্তিক ব্রত বা নিয়ম সেবা করে তাহলে তার চাতুঃর্ম্মাস্যের ফলপ্রাপ্তি হয়।

সর্বশেষে রাধাদামোদরাষ্টকম্ এবং রাধাদামোদর কীর্তন বর্ণনা করা হল। যথা –

শ্রীশ্রী রাধা দামোদরাষ্টকম্

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপম্, লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানম্, পরামৃষ্টমত্যাং ততো দ্রুত্যে গোপ্যা॥ ১

রুদন্তং মুহূর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তম, করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুশ্বাসকম্পত্রিরেখাঙ্ক কণ্ঠস্থিত গ্রৈব দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্॥ ২

ইতীদৃক খলীলাভিরানন্দকুণ্ডে, স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তের্জিততত্বম্, পুনঃ প্রেমতস্ততং শতাবৃত্তি বন্দে॥ ৩

বরং দেব মোক্ষাং ন মোক্ষাবধিম বা, ন চান্যং বৃণেহহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপূর্নাথ গোপালবালম্ সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ॥ ৪

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈর্বৃত্যং কুণ্ডলস্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চম্বিত বিম্বক্তধরং মে, মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ॥ ৫

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো, প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীন বতানু, গৃহানেশ মমাঞ্চ মেধ্যাক্ষিদৃশ্যঃ॥ ৬

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ক্ত্যৈব যদ্ধত্ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ,
তথা প্রেমভক্তি স্বকং মে প্রযচ্ছন, মোক্ষে গ্রহো মেহস্তি দামোদরেহ॥ ৭

নমস্তেহস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে, ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ, নমোহনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্॥ ৮

BANGLADARSHAN.COM

ইতি পদ্মপুরাণ অন্তর্গত সত্যব্রত মুনি প্রোক্তং শ্রীশ্রী দামোদরাষ্টকম্।

॥সমাপনম্॥

॥ শ্রীশ্রী রাধাদামোদরাষ্টকম্ এর পদ্যানুবাদ ॥

স্বরূপে সচ্চীদানন্দ, গোকুলে আনন্দকন্দ, শোভাকারে অতি মনোহর।
যশোদা রক্ষিত ননী, হরণ করেন যিনি, উদখোল করিয়া উপর॥
দণ্ডভয়ে লাফ দিয়া, বেগে যায় পালাইয়া, মা যশোদা পাছু পাছু ধায়।
ধরিলেন পৃষ্ঠদেশ, যিনি হন পরমেশ্ব, প্রণমামি দামোদর পায়॥ ১
জননীর হস্তে যষ্ঠী, পড়িল গোপালের দৃষ্টি, ভীত আঁখি ছাড়ে ঘনশ্বাস।
পদ্মহস্ত দিয়া দুটি, আঁখি মুছে পরিপাটি, পাইয়াছে যেন মহাত্রাস॥
তনু ভয়ে কাঁপে যার, কণ্ঠে দোলে মুক্তাহার, উদরেতে রজ্জুর বন্ধন।
সেই দামোদর হরি, ভক্তি বশে সদা স্মরি, বন্দী তার রাতুল চরণ॥ ২
এইমতো বাল্যলীলা, গোকুলেতে প্রকাশিলা, অজিৎ হইয়া ভক্ত জিত চিত।
গোকুলবাসী সবারে, লীলানন্দ সরোবরে, করিলে প্রভু তুমি নিমজ্জিত॥
ভক্ত বশীভূত হরি, প্রকাশিলা লীলা করি, সর্বরসময় গুণ আধার।
ঈশ্বর শ্রীদামোদর, আমি প্রেম সহকারে, বন্দী যে গো শত শত বার॥ ৩
বড়ো দানে ভক্তিধর, ওহে দেবো পরাৎপর, মুক্তি আদি যত কিছু হয়।
চাহি না যে মোক্ষ আমি, একম কি বৈকুণ্ঠভূমি, যাহা আছে মুক্ত চতুঃষ্টয়॥
কেবল প্রার্থনা মোর, গোপাল মুরতি তোর, যেন হৃদপটে প্রকাশিত হয়।
অন্তর্যামী রূপে তুমি, সদা আছে জানি আমি, তবুও বাল্যরূপ চিন্তা আছয়॥ ৪
হে দেব তব বদন কমল, অতি স্নিগ্ধ শ্যামল, রক্তবর্ণ কেশগুচ্ছ সার।
বিম্বফল সম যার, রক্তাম্ব অধর যার, মা যশোদা চুম্বে বারবার॥
হে মুখ মধুরিমা, নাহি পায় তার সীমা, সদা ভয় এই মোর মনে।
ঐশ্বর্য্যাদি লক্ষ লক্ষ, পাইলেও আর মোক্ষ, প্রয়োজন নাহি কৃষ্ণ বিনে॥ ৫
হে দেব! হে দামোদর! হে অনন্ত বিষ্ণুপর! আমার তুমি প্রসন্ন হউ।
হে প্রভু গোকুলেশ্ব! ভবসিন্ধু দেয় ক্লেশ, দুঃখ হইতে পার করে দাও॥
দুঃখ রূপ সিন্ধু নীড়ে, ডুবি সদা কর্ম্ম ফেরে, মরণ নিকট অতি ঘোর।

BANGLADARSHAN.COM

তব অমৃত কৃপাদৃষ্টি, করো মোর করো বৃষ্টি, দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ মোর॥ ৬

ওহে প্রভু দামোদর, রজ্জু গ্রস্থ হইয়া পর, শাপগ্রস্থ কুবের পুত্রদ্বয়ে।

মুক্তি করিলে দানী, ওহে অমৃতের খনি, হেন শক্তি আন নাহি হয়ে॥

হেন প্রেমশক্তি ধন করো মোরে বিতরণ, এই ভিক্ষা যাচি অনুক্ষণ।

ভক্তিতে আগ্রহ মোর, মোক্ষ গ্রহণে অনাদর, হয় যেন লভি কৃপাক্ষণ॥ ৭

দাম বন্ধ উদরেতে চাহি সদা প্রণমিতে তেজময় বিশের আধার।

হে দেব করুণাকর, তুমি তো জগদিশ্বর, তোমা ছাড়া কিবা আছে আর॥

প্রিয়তমা শ্রীরাধিকা তব প্রিয় প্রাণাধিকা, পদে নতি করি বারবার।

হে অনন্ত লীলাময়, তব দাসে যেন কৃপা হয়া, সদা তাই করি নমস্কার॥ ৮

শ্রীশ্রী রাধাদামোদর পদকীর্তন

জয় রাধাদামোদর, জয় রাধাদামোদর। জয় রাধাদামোদর দয়া কর হে।

কার্ত্তিকের অধিদেব জয় রাধাদামোদর। জয় রাধাদামোদর দয়া কর হে।

মা যশোদার প্রাণধন জয় রাধাদামোদর। জয় রাধাদামোদর দয়া কর হে।

রদখোলে বন্ধন জয় রাধাদামোদর। জয় রাধাদামোদর দয়া কর হে।

নদের নন্দন জয় রাধাদামোদর। জয় রাধাদামোদর দয়া কর হে।

পুতনা নাশন জয় রাধাদামোদর। জয় রাধাদামোদর দয়া কর হে।

কালীয় দমন জয় রাধাদামোদর। জয় রাধাদামোদর দয়া কর হে।

গোবর্দ্ধন ধারণ জয় রাধাদামোদর। জয় রাধাদামোদর দয়া কর হে।

শ্রীরাধার প্রাণধন জয় রাধাদামোদর। জয় রাধাদামোদর দয়া কর হে।

জীব গোস্বামীর প্রাণধন জয় রাধাদামোদর। জয় রাধাদামোদর দয়া কর হে।

এবার আমায় দয়া কর জয় রাধাদামোদর। জয় রাধাদামোদর দয়া কর হে।

তব চরণে স্মরণ নিলাম জয় রাধাদামোদর। জয় রাধাদামোদর দয়া কর হে।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীপাট ভরতপুর

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত শক্তিকম্॥
(চৈ: চ: আদি ৭ম পরি)

ভক্তরূপ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার শ্রী অদ্বৈত, ভক্ত নামক শ্রীবাসাদি, ভক্তশক্তি শ্রীগদাধরাদি এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রকে প্রণাম করি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, তাঁর বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে "শ্রীল গদাধর পণ্ডিত" কে ভক্তিশক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। কবিকর্ণপুর বিরচিত "গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা" গ্রন্থে বলেছেন, –পূর্ব্বে যিনি প্রেমরূপা শ্রীরাধা বৃন্দাবনেশ্বরী ছিলেন, তিনিই এক্ষণে গৌরবল্লভ শ্রীগদাধর পণ্ডিত। এখানে কিছু কথা বলে রাখা ভালো। যাদের হৃদয় গৌরপ্রেম বন্যাতে প্লাবিত হয়েছে, অর্থাৎ যারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে পরিপূর্ণ ভগবান বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, তাঁরা সহজেই জানেন শ্রীল গদাধর পূর্বভাবে শ্রীরাধারাণী ছিলেন। কিন্তু যারা যুক্তি দ্বারা এবং প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা অপ্রাকৃত গৌরলীলা আস্বাদনের প্রচেষ্টা করেন তাদের হৃদয়ে হয়তো সংশয় আসতে পারে। সেই সংশয় নিবারণের জন্য বলা। শ্রীভগবান গোবিন্দ যখন ব্রজলীলা সমাপণ করে সাঙ্গপাঙ্গ সহিত কলিযুগে প্রকট হয়েছেন তখন তার প্রত্যেক পার্ষদ বৃন্দও গৌরলীলা রসাস্বদনের জন্য অবতরণ করেছেন। সেই কারণেই রাধাকৃষ্ণ মিলিত গৌর অবতরণ করেছেন। আর তাঁর হ্লাদিনী শক্তি রাধা গদাধর পণ্ডিত রূপে অবতরণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আরও আলোচনা করলে অকারণে মূল বিষয়বস্তু অকারণে বৃদ্ধি পাবে। পরে অন্য কোন স্থানে এই বিষয়ে উল্লেখ করব।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রীগদাধর পণ্ডিত ১৪০৮ শকাব্দে ইং ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখী অমাবস্যাতে বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুর মহকুমার বেলেটি গ্রামে আবির্ভূত হন। শ্রীগদাধরের পিতা শ্রীমাধব মিশ্র এবং মাতা শ্রীমতী রত্নাবতী দেবী। শ্রীগদাধর পণ্ডিত বারেন্দ্র শ্রেণির কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। শ্রীমাধব মিশ্র তাঁর দুই পুত্র –গদাধর ও বাণীনাথ কে নিয়ে স্বপরিবার বাংলাদেশ থেকে নবদ্বীপের চাঁপাহাটি বা চম্পাহাটি গ্রামে বাস শুরু করেন। এই চাঁপাহাটিতে থাকাকালীনই নবদ্বীপে এবং তৎ সংলগ্ন বিদ্যানগরে গদাধর শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়েই তিনি শচীর দুলাল নিমাই এর পরিচিত ও বন্ধুত্বের সম্পর্কে মিলিত হন। পরবর্তী কালে শাস্ত্র অধ্যায়ন পূর্ণ করে নবদ্বীপের তৎকালীন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের অনুমোদনে পণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত হয়ে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত নামে চিরকালের জন্য খ্যাত হন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ২৪ বৎসর নবদ্বীপ লীলানুক্রমে যখন নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীর সন্নিকটে দীক্ষা গ্রহণের পরে, নবদ্বীপের গৌরহরি রূপে গয়া থেকে ফিরে এলেন। শুরু করলেন কলিযুগের পরম আশ্রয় নাম সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন

কার্য। এই সময়েই শ্রীমন মহাপ্রভুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীক ভাবে গদাধর পণ্ডিত যুক্ত ছিলেন। এই সময়েই গৌরহরির নির্দেশে গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরীক্ষ বিদ্যানিধির কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। যখন শ্রীমন্ মহাপ্রভু কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখনও সন্ন্যাসের সাক্ষী ও দর্শনকারী পাঁচজন সঙ্গীর মধ্যে গদাধর ছিলেন একজন।

নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সহিত।
গোবিন্দ পশ্চাতে আর কেশব ভারতী॥

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমন্ মহাপ্রভু যেদিন বক্রেশ্বর তীর্থ গমন, রাঢ়দেশে পবিত্র করেন, সেই সময় প্রিয় সহচর গদাধরের সঙ্গে ভরতপুরের ১ .৫ মাইল উত্তরপূর্ব ময়ুরাক্ষীর শাখা কুয়ে নদীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীচরণ ধৌত করেন। জায়গাটি বর্তমান আলুগ্রামে ধোয়াঘাট নামে প্রসিদ্ধ। সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করলে, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ও আজীবন ব্রহ্মচারী ব্রত গ্রহণ করে এবং ক্ষেত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলেই অবস্থান করতেন।

নীলাচলে যেখানে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত থাকতেন, সেই উদ্যানে বা তোটা তে বালুকা রাশির মধ্যে থেকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীগোপীনাথ, শ্রীরাধিকা, শ্রী ললিতা বিগ্রহ প্রকট করেন। এই তোটা গোপীনাথের সেবাতেই শ্রীল গদাধর পণ্ডিত নিযুক্ত থাকতেন। এই গোপীনাথের রাধিকা ও ললিতা ব্যতিক্রম্য ভাবে কৃষ্ণবর্ণা। বলা হয়, কৃষ্ণ প্রেমে আবিষ্টা হয়ে তাঁরা কৃষ্ণবর্ণা হয়েছেন। এই মন্দিরে শ্রীগোপীনাথ মধ্যসনে উপবেশন অবস্থায় আছেন। তবে যখন শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রকট হয়েছিল তখন কিন্তু গোপীনাথ উপবেশনরত ছিলেন না। এই বিষয়ে বলা হয়, শ্রীগদাধর শিষ্য মামু ঠাকুর বৃদ্ধ ও কুঁজো হলে বিগ্রহকে মালা পরাতে অসুবিধা হত। শ্রীগোপীনাথকে সেই কথা জানালে ভক্তের যাতে কষ্ট না হয় তাই তিনি নিজে ভক্তের ভক্তিতে বসে পড়েন। পৃথিবীতে যত কৃষ্ণ বিগ্রহ আছে, তাঁর মধ্যে পুরীর তোটা গোপীনাথ এবং কাটোয়ার গৌরাঙ্গ পাড়ার শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহতেই শ্রীকৃষ্ণ উপবেশনরত। এই তোটা গোপীনাথ মন্দিরে গৌর গদাধরের বহু লীলার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শ্রীল গদাধরের পিতা মাধব মিশ্রের সুররাজ নামক এক ক্ষত্রিয় শিষ্য ছিল। তাঁরই আগ্রহে শ্রীল গদাধরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাণীনাথ ভরতপুর গ্রামে এসে শ্রী শ্রী রাধাগোপীনাথের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। এই বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ। যিনি বহু পদাবলীকীর্তন, গদাধর অষ্টক, অষ্টক পদাবলী প্রভৃতির রচয়িতা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কোনপ মহোৎসবের অধিবাসের প্রথম পদ –"জয় জয়রে গোরা, শ্রী শচীনন্দ, মঙ্গল নটন সুঠাম"–পদটি গদাধর ভ্রাতৃপুত্র নয়নানন্দের রচনা। এই নয়নানন্দকে শ্রীল গদাধর অপ্রকটের সময় তাঁর স্বহস্তে লেখা গীতা এবং তাঁর গলদেশে থাকা মেয়ো কৃষ্ণ বিগ্রহ প্রদান করে যান, (হাতে বুড়ো আঙ্গুল থেকে মধ্যমা অঙ্গুল পর্যন্ত পরিমাণকে 'মেয়ো' বলে) এই মেয়ো কৃষ্ণ এবং গদাধর হস্তে রচিত গীতা আজও ভরতপুর শ্রীপাট সেবিত হচ্ছে। বর্তমানে নয়নানন্দের বংশধরগণই এই শ্রীপাটের সেবাইত রূপে সেবাতে রত।

BANGLADARSHAN.COM

বর্তমানে প্রচলিত গীতাতে ৭০০টি শ্লোক পাওয়া যায়। যার ক্রম –ধৃতরাষ্ট্র কথিত ১টি, সঞ্জয় কথিত ৪০টি, অর্জুন কথিত ৮৪টি এবং শ্রীভগবান্ কথিত ৫৭৫টি প্রাপ্ত হয় । কিন্তু শ্রীল গদাধর রচিত গীতাতে ৭৪৫টি শ্লোক পাওয়া যায়। যথাক্রমে–ধৃতরাষ্ট্র কথিত ১টি, সঞ্জয় কথিত ৬৭টি, অর্জুন কথিত ৫৭টি এবং শ্রীভগবান্ কথিত ৬২০টি পরিলক্ষিত হয়। গীতাটি ২০০৪ সালে সকল সেবাইতের প্রচেষ্টায় এবং ভারত সরকারের (INTACH, ICI, OACC বিভাগের পূর্ব্বাঞ্চল শাখা State Museum Premises, Bhubeneswar, ORISSA) থেকে শ্রীমতি মৈত্র এবং শ্রী বিষ্ণুপ্রসাদ নায়ক মহাশয়ের উদ্যোগে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়।

বর্তমান এই শ্রীপাটের মন্দির, নাটমন্দির সংস্কার হয়েছে। শ্রীপাটে রাধাগোপীনাথ, বেণুধর গৌর, মেয়োকৃষ্ণ, গোপাল, শালগ্রাম, গদাধর হস্তে রচিত গীতা সেবিত হচ্ছেন। এই শ্রীপাটের গীতাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর হস্তে লেখা একটি শ্লোক পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রীপাটের প্রধান উৎসব হল বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের আবির্ভাব তিথি মহোৎসব। এছাড়া জন্মাষ্টমি, রাধাষ্টমী, রাস, দোলযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ২০১১ সালে ভরতপুর শ্রীপাট থেকে এই শ্রীপাটের সেবাইত জ্যোতির্ময় গোস্বামী এবং কান্দীর প্রণব আচার্যের প্রচেষ্টায় একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখিত অধিকাংশ কথাই এর "স্মরণিকা" থেকে নেওয়া হয়েছে। এই স্মরণিকা ছাড়াও আমি নিজে ভরতপুর গিয়েছিলাম শ্রীমদ্ভাগবত কথাবাচক হিসাবে। শ্রীপাটের সেবাইত জ্যোতির্ময় গোস্বামীই আমাদের যেতে অনুরোধ জানান। জোতির্ময় গোস্বামীর অনুগ্রহেই আমরা শ্রীল গদাধরের শ্রীপাট এবং শ্রীল গদাধরের সেবিত বিগ্রহ দর্শন করে নয়ন সার্থক করলাম। তাঁর এবং তাঁর পরিজনদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমেই এই শ্রীপাটের কথা এবং তাদের অতুল প্রচেষ্টার কথা উপলব্ধি করতে পারলাম। কাটোয়া হইতে আজিমগঞ্জের শাখায় সালার রেলস্টেশন থেকে নেমে বাসে ১৫ কিমি দূরে অবস্থিত এই শ্রীপাটটি। আধুনিক আলট্রা মডার্ণ যুগের নাম করে যখন ভারতবর্ষ, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ যখন আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন এই "ভরতপুর শ্রীপাটের" সেবাইতবৃন্দের সেবা ও শ্রীপাটের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা সত্যই প্রণম্য।

জয় গৌর। জয় গদাধর।

BANGLADARSHAN.COM

সম্প্রদায়–অসম্প্রদায়

সম্প্রদায়বিহীন যে মন্ত্রাস্তে নিস্ফলা মতাঃ।
সাধনৌর্ঘৈন সিধ্যান্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চাত্বরঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্মারুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত আদি তথা পদ্মপুরাণের এই শ্লোকে স্পষ্ট যে –"যদি কোনো ব্যক্তি সম্প্রদায়বিহীন হয়ে মন্ত্র গ্রহণ করে তাহলে তার মন্ত্র নিস্ফল হবে। শুধু তাই নই, সেই ব্যক্তি যদি কোটি কল্প ধরেও সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র জপ করে তাও তার কোনো ফল হবে না। কলিযুগে চারটি সম্প্রদায় হবে। যথা –শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র এবং সনক। যারা বৈষ্ণবধর্ম মন্ত্র প্রদান করে জগৎকে পাবন করবে।

এই পদ্মপুরাণের শ্লোক দিয়ে আমার প্রবন্ধের সূচনা দেখেই হয়তো অনেকে আমার লেখনীর মনোভাব বুঝতে পেরেছেন। তবুও বলি, আজ ২০১৭ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়িয়ে যদি সমাজের দিকে তাকানো হয় তাহলে দেখা যাবে সমাজ, বিশেষত ভারতীয় সমাজ আজ বিপন্ন। এই বিপন্নতার মূলক কারণ, আজ অধিকাংশ মানুষের চারিত্রিক অবক্ষয় হচ্ছে। এই অবক্ষয়ের মূল কারণ হল –ধর্মের গ্লানি। গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন, –যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি ভবতি ভারত।" হে ভারত (অর্জুন) যখন ধর্মের গ্লানি হয় তখন অধর্মকে নাশ করতে, সাধুদের পরিত্রাণ করতে, দুষ্কৃতিদের বিনাশ করতে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হয়। এখান থেকে স্পষ্ট যে ধর্মের কোনোদিনই নাশ হয় না। ধর্মে গ্লানি আসে। আজ কলির প্রথমার্দ্ধে সবথেকে বেশি গ্লানি ধর্মেই। ধর্মে ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠছে আড্ডা দেওয়ার জায়গা। ধর্ম ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠছে মনোরঞ্জনের বিষয়। চারদিকে কত শত সম্প্রদায়। সাধারণ মানুষ আজ দিশাহারা। এই অবস্থা থেকে আমরা আশার আলো পাবো কিভাবে ? যদি কোনো ব্যক্তিকে অনুসরণ করি তাহলে তিনি ইহলোক ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কী হবে ? তাই এখন উপায় কী ?

এই প্রশ্নগুলির সমাধান করতে গিয়ে আমার ঐকান্তিক মত, যদি আমরা শাস্ত্রের বিচারে এই উত্তরগুলি খুঁজবার প্রচেষ্টা করি তাহলেই উত্তরগুলি খুঁজে পাবো। কারণ শাস্ত্রই একমাত্র নিরপেক্ষ। যেমন কোনো দেশে বসবাস করতে গেলে দেশের সংবিধান মেনে চলা উচিত। তেমনিই ভগবানের দ্বারা এবং ভগবৎপ্রাপ্ত মহর্ষিদের দ্বারা প্রণীত শাস্ত্র, যা কিনা, পৃথিবীর সংবিধান, তা মেনে চলাও একান্ত প্রয়োজন। বেদ শাস্ত্রের উপর কেউ নন। এমনকি ভগবানও নন। তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায় –দশাবতারের নবমাবতার বুদ্ধদেব ভারতের (তদকালীন) কপিলাবস্তু নগরে আবির্ভূত হন। বুদ্ধদেবের বৌদ্ধ ধর্ম পৃথিবীর বহু দেশে বিস্তৃতি লাভ করলেও ভারতে তার প্রভাব নেই। এমনকি তার আবির্ভাব

BANGLADARSHAN.COM

তিথিও অন্যান্য অবতারগণের তিথির ন্যায় পালিত হয় না বৈদিক সনাতন ধর্ম্মে। কেন ? এর কারণ তিনি (বুদ্ধদেব) বেদের নিন্দা করেছিলেন। জয়দেব গীতগোবিন্দে বললেন, "নিন্দসি যজ্ঞবিধেয়হহ শ্রুতিজাতং, সদয়-হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্। কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে॥" ভারতবর্ষ এমন এক দেশ, যেখানে শাস্ত্র নিন্দা করলে ভগবানের অবতারও আমাদের কাছে পূজিত হন না। কিন্তু হায় রে মূর্খ জীব, শিক্ষার দম্ভে দম্ভিত হয়ে তথাকথিত শিক্ষিত মানুষগণই আমাদের ভারতীয় বেদ শাস্ত্রের নিন্দা করতে পিছু পা হন না।

যাই হোক, প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লেখিত পদ্মপুরাণের শ্লোক থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র গ্রহণ করলে তা নিস্ফল হবে। এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা ও নামও পদ্মপুরাণে কলিযুগ আসার বহুপূর্বে উল্লেখ করে দিয়েছেন। "প্রমেয় রত্নাবলী" গর্গসাং হিতা প্রভৃতি গ্রন্থে চতুঃ সম্প্রদায়ের আচার্য্যদের কথা বলেছেন। যথা –
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥ (প্রমেয় রত্নাবলী)
কলিযুগে রামানুজাচার্য্য–"শ্রী" সম্প্রদায়ের, মাধবাচার্য্য "ব্রহ্মা" বিষ্ণুস্বামী –রুদ্র সম্প্রদায়ের এবং নিম্বার্কাচার্য্য সনক সম্প্রদায়ের আচার্য্য। আর এই চার সম্প্রদায় অর্থাৎ (১) শ্রীরামানুজাচার্য্য সম্প্রদায়, (২) শ্রীমাধবাচার্য্য সম্প্রদায়, (৩) শ্রী বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় বা বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায় এবং (৪) শ্রী নিম্বার্কচার্য্য সম্প্রদায় –এই চতুঃসম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরাযুক্ত শাস্ত্রসম্মত ও আচরণশীল ভগবত প্রেমীজনের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করলে, তবে সেই মন্ত্রের কর্ম হবে। অর্থাৎ সেই মন্ত্রই মন্ত্রের ধেয়্য শ্রীভগবান প্রাপ্তিতে অথবা মুক্তি প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে। এই কথাগুলি হয়তো অনেকের ভালো লাগতে নাও পারে। কিন্তু আমি এখানে একটিও আমার কথা বলি নাই। প্রত্যেকটি কথাই শাস্ত্রের। যার জন্য শ্লোকের পাশে গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে দিয়েছি। তবুও তাদের সংশয় থাকতে পারে। তাদের সংশয়ের জন্য কিছু করার নেই। কারণ আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এত বেশি বিস্তার হয়ে গিয়েছে যে দেশ জগতের "গুরু" ছিল। সেই জগৎ গুরু ভারতবর্ষকে আজ দাসত্ব মানসিকতা নিয়ে চলতে চলতে দাসত্ব চরিত্রের হয়ে গিয়েছে। নিজের দেশের হাজার হাজার বছর পুরোনো শাস্ত্রকথা আমাদের ভালো লাগে না। কিন্তু বিদেশের আকথা, কুকথা, অপসংস্কৃতি আমাদের কাছে অতি মনোরঞ্জিত লাগে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় –বাড়িতে মা রুটি করে দিলে খেতে ভালো লাগে না, কিন্তু সেই ময়দা দিয়ে কোনো বিদেশী খাবার এনে দিলে মনের আনন্দে আমরা তা গ্রহণ করি। পাড়াতে হরিনাম হলে সেখানে গিয়ে বসতে আমাদের লজ্জা হয়, কিন্তু যখন বিদেশীরা হরিনাম করে সেখানে গিয়ে নৃত্য করতেও পিছু পা হই না। তাই তাদের ভগবান সদ্‌বুদ্ধি প্রদান করুন এই প্রার্থনা অনন্তানন্ত সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের কাছে করি।

BANGLADARSHAN.COM

এখানে যে চারজন আচার্য্যের বলা হয়েছে তারা কেউই, এখনকার মতো কিছু লোককে একত্রিত করে নিজে নিজেই আচার্য্য হয়ে যাননি। পূর্বে উল্লেখিত চারজন আচার্য্যের কথা তাদের আবির্ভাবের বহু পূর্বে পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই চারজন আচার্য্যই ভারতবর্ষের ভিত্তি স্বরূপ ষট দর্শনের (গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, কপিলের সাংখ্য, জৈমিনির কর্মমীমাংসা, পাতঞ্জলীর যোগ এবং ব্যাসদেবের বেদান্ত দর্শন) মধ্যে ব্যাসদেবের বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন। নিজেদের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন। তবে তাঁরা আচার্য্য স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন চিরকালের জন্য। বেদান্তগত বিষয়বস্তু সুবোধ্য না হলেও, অবোধ্য নয়। যদি যথাযোগ্যভাবে বেদান্ত দর্শন আস্বাদন করা যায় তাহলে ধীরে ধীরে বেদান্তগত বিষয়ও বোধগম্য হওয়া শুরু হয়।

শ্রীরামানুজাচার্য্য “শ্রীভাষ্য” রচনা করে “বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ” এর প্রণয়ন করেন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য –“ভেদাভেদবাদ”ত এর প্রণয়ন করেন। শ্রী বল্লভাচার্য্য এবং বিষ্ণুস্বামী “দ্বৈতবাদ” এর প্রণয়ন করেন। আর শ্রী মাধবাচার্য্য তিনটি ভাষ্য রচনা করে “শুদ্ধ দ্বৈতবাদ” প্রণয়ন করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বা শ্রীশ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমাধবাচার্য্য সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হন। তাই এখানে শুদ্ধ-দ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমন্ম মাধবাচার্য্য এর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি। তদকালীন ভারতবর্ষের দক্ষিণকানারা জেলার অন্তর্গত উড়ুপীরের সন্নিকটে পাজকা ক্ষেত্রে বিজয়া দশমী তিথিতে আবির্ভূত হন। তাঁর পিতার নাম মধ্যগেহ এবং মাতার নাম বেদবিদ্যা। গৃহে বাল্যবস্থায় তাঁর নাম ছিল শ্রীবাসুদেব। ইনি দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে কালে মাতা-পিতার অজ্ঞাতসারে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তাঁর নাম হয় পূর্ণ প্রজ্ঞতীর্থ ও পরে আনন্দতীর্থ নামে পরিচিত হন। আচার্য্যত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক তিনি শ্রীমন্ মাধবাচার্য্য নামে জগতে খ্যাত হন।

শ্রীমাধবাচার্য্য প্রধান বায়ুর তৃতীয় অবতার বলে প্রসিদ্ধ হন। প্রধান বায়ু ত্রেতাযুগে হনুমান রূপে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করেছেন, দ্বাপরে ভীমরূপে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করেন, কলিতে বিষ্ণুর আবেশাবতার শ্রীব্যাসদেবের অনুচর শ্রীমাধবাচার্য্য রূপে সেবা করলেন।

শ্রীমাধবাচার্য্য শ্রীবদরিকাশ্রমে শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করে ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য রচনা করেন। তিনি প্রথমে ‘সূত্রভাষ্যম’ নামে যে ভাষ্যখানি রচনা করলেন এই ভাষ্যটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তিনি দ্বিতীয় ভাষ্যরূপে ‘অনুব্যাখানম্’ বা ‘অনুভাষ্যম্’ রচনা করেন। এরপরে শ্রীমাধবাচার্য্য ‘অনুভাষ্যম’ নামক ভাষ্য রচনা করে শুদ্ধ দ্বৈতবাদ প্রণয়ন করেন। এই শুদ্ধদ্বৈতবাদ তিনি ‘পঞ্চভেদ’ স্বীকার করেন। এই পঞ্চভেদ হল –(১) ‘জীবে ঈশ্বরে ভেদ”, (২) ‘জীবে জীবে ভেদ’, (৩) ‘ঈশ্বরে জড়ে ভেদ’, (৪) ‘জীবে জড়ে ভেদ’, এবং (৫) ‘জড়ে জড়ে ভেদ’ । এই পঞ্চবেদ নিত্য, সত্য এবং অনাদি। শ্রীমাধবাচার্য্য বেদান্তের ভাষ্য ছাড়াও ঐতরেয় ভাষ্য, বৃহদারণ্যকভাষ্য, ছান্দোগ্যভাষ্য,

BANGLADARSHAN.COM

তৈত্তিরীপোপনিষদভাষ্য, ঈশাবাস্যোপনিষদভাষ্য, কঠোকোপনিষদভাষ্য, আথর্বনোপনিষদভাষ্য, ঈশোপনিষদভাষ্য প্রভৃতি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন। এছাড়াও তিনি শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, মহাভারতের ও ভাষ্য রচনা করেন। শ্রীমাধবাচার্য্য তার স্থাপিত অষ্টমঠের সেবা আটজন সন্ন্যাসীকে প্রদান করে ৭৯ বছর বয়সে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে শিষ্যদের কাছে ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্য ব্যাখ্যা করতে করতে স্বধামে গমন করেন। শ্রীমন্মমাধবাচার্য্যের শিষ্য পদ্মনাভ। পদ্মনাভের থেকে পরম্পরাগতভাবে মাধবেন্দ্রপুরী আসেন। মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্য ঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরপুরী গয়াধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দীক্ষাদান করেন। তখন থেকেই শ্রীমাধবাচার্য্য সম্প্রদায় শ্রীমাধবাচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় নামে খ্যাতি লাভ করে। কিন্তু শ্রীমাধবাচার্য্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়' এই কথাটি যোগ দেওয়া এত সহজ হয়নি। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজ হস্তে কোনো ভাষ্য লিখে যাননি। তবে তার 'অচিন্ত্যভেদা ভেদবাদ' সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন। 'অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ' কী তা পরে অন্য কোথাও সুযোগ পেলে বর্ণনা করব।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর প্রায় ১৫০ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। জয়পুরে তখন শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রকটিত শ্রী শ্রী গোবিন্দ বিগ্রহের সেবা ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উপর ন্যস্ত। শ্রী সম্প্রদায়ী কয়েকজন মহান্ত বৈষ্ণব গিয়ে শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ পূজার অগ্রে শ্রীনারায়ণ পূজার প্রথা চলবার ব্যবস্থা করেন। সদাচরী রাজা তাতে সম্মত না হলে বৃন্দাবন থেকে পণ্ডিতদের খবর দেওয়া হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কোনো ভাষ্য না থাকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের চতুঃসম্প্রদায়ের স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছিল না। এইরূপ বিকট পরিস্থিতিতে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী বৃন্দাবনের তদকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বৃদ্ধ হওয়ার জন্য শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ জয়পুরে প্রেরণ করেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ 'জয়পুরে' আয়োজিত চতুঃসম্প্রদায় সভাতে শ্রী শ্রী গৌরগোবিন্দের কৃপাতে সমস্ত পণ্ডিতগণ তথা আচার্য্যদের সিদ্ধান্ত নিজের এবং পূর্ব আচার্য্যদের যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেন এবং 'শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যম্' নামক ভাষ্য রচনা করে 'অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ' চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি করলেন। সেইক্ষণ থেকে আমরা 'শ্রীমাধবাচার্য্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়' রূপে চতুঃসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি করলাম। তাই এতটাই কঠিন পথ পেরিয়ে আজ আমরা নিজেদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলে দাবী করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু আজ শ্রীমাধবাচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিপন্ন। কারণ আজ ধর্ম্মের নামে ক্লাব, ধর্ম্মের নামে আড্ডাখানা, ধর্ম্মের নামে রেফারিং, ধর্ম্মের নামে আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি গ্লানিতে আজ শ্রীমাধবাচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের টিকে থাকার দুষ্কর হয়েছে। তার মধ্যে আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে গুরু রূপে প্রতিষ্ঠিত কিছু লোভী, আচারণ ও নিষ্ঠাহীন, ভগবত বিমুখী বিষয়ী ব্যক্তিরা তো আছেই। এরপরে আবার গুরুবাদী, ব্রহ্মবাদী, মায়াবাদী প্রভৃতিরা আগে থেকেই আছেন। তারপর –আউল, বাউল প্রভৃতি অসম্প্রদায় যারা কৃষ্ণভজনের নামে অপসংস্কৃতির প্রচার প্রসারে উদ্যত। এই কারণেই এই প্রতিবেদনটি

BANGLADARSHAN.COM

লিখলাম। যাতে সম্প্রদায় কয়টি ও কীকী তার সম্বন্ধে একটু ধারণা মানুষের মধ্যে আসে। আমার কোনো সাহিত্য প্রতিভা নেই। তাই প্রতিবেদনে সাহিত্যগত দোষ থাকতেই পারে। কোনো সাহিত্যগত দোষ থাকলে মূর্খ জ্ঞান করে মার্জনা করবেন। আশা রাখলাম এই প্রতিবেদনটি পড়ে অন্ততঃ চতুঃসম্প্রদায়ের আশ্রয়ে গিয়ে মন্ত্র গ্রহণ করে ভগবত প্রাপ্তির প্রচেষ্টা করব। এই প্রতিবেদনটিতে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূজণ, শ্রী বিশ্বনাথ চক্তবর্তী প্রমুখদের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যতে অন্যত্র আলোচনা করব ইচ্ছা রইল। আজ এইখানেই ইতি টানলাম। জয় গৌর, জয় গোবিন্দ, চার ধাম কী জয়। চার সম্প্রদায় কী জয়।

শ্রী মাধবাচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী

শ্রীনারায়ণ → ব্রহ্মা → শ্রীনারদ → ব্যাসদেব → শ্রীমন্মধবাচার্য্য → পদ্মনাভ → নরহরি → মাধব → অক্ষোভ → জয়তীর্থ → জ্ঞানসিন্ধু → দয়ানিধি → বিদ্যানিধি → মাধবেন্দ্রপুরী → ব্যাসতীর্থ → ব্রক্ষণ্য → পুরুষোত্তম → জয়ধর্ম্ম → রাজেন্দ্র → ঈশ্বরপুরী → শ্রীমন্ মহাপ্রভু

BANGLADARSHAN.COM